নিকোবর ও পিলপি

সুব্রত হালদার

পৃথিবীর উন্নততম শহরগুলি থেকে শুরু করে ভয়ঙ্কর-সুন্দর সুন্দরবন, বহু জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু ভ্রমণের গল্পে আড্ডায় ঘুরে ফিরে আসে সেই নিকোবর।

ভারত এর মূল ভূখন্ড থেকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে সিন্ধুতে বিন্দুর মত কয়েকশো ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ একই সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোরই পোশাকি নাম আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এই সারির শেষ দ্বীপগুলি অর্থাৎ দক্ষিণে ভারতের শেষ ভূখন্ড নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রধান দ্বীপগুলি হল লিটিল-নিকোবর, গ্রেট-নিকোবর ও কার-নিকোবর। এরমধ্যে কার-নিকোবরেই লোকবসতি অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি যেটা, ছিলো আমার গন্তব্যস্থল, নব্বই-এর দশকের প্রথমদিকে। দ্বীপটি আকৃতিতে গোল। সঠিকভাবে বলতে গেলে কমা (,) চিহ্নের মত। বেড় কমবেশি ১৫ কিঃমিঃ। সমুদ্র শান্ত ও হালকা তুতে রঙের। এমন সুন্দর সমুদ্রের রঙ ভূ-ভারতে আর কোথাও দেখিনি। দ্বীপটির মাঝখানে ঘন জঙ্গল। জঙ্গল ঘিরে চক্রাকারে সমুদ্রের তটরেখা বরাবর আদিবাসীদের গ্রাম। ইচ্ছা করলে সময় থাকলে সমুদ্রের ধারে হেঁটে হেঁটে দ্বীপটিকে পাক দেওয়া যায়। যেহেতু ভ্রমণার্থিদের প্রবেশ নিষেধ এবং গুটিকয় শহুরে লোকই ওখানে যায় সেহেতু হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা অকৃত্তিম সৌন্দর্যের আধার হল নিকোবর। বালির তটরেখা ঢেকে রেখেছে অপূর্ব সুন্দর অজস্র কোরাল বা শামুক। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সাদা, সোনালি অজস্র। ঠিক এতটাই সুন্দর নারিকেলের বন। এত ঘন আকশ দেখা যায় না। যেন পৃথিবীর মধ্যে আর এক পৃথিবী। থাকার প্রাইভেট হোটেল বলতে কিছু নেই। নেই বলেই চলে সাধারণের যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ভ্রমণার্থিদের প্রবেশ নিষেধ। তবে কারা যেতে পারে? তারাই, যারা কোন সরকারি কাজে যাচ্ছে বা স্থানীয় কোন পরিবার তার থাকা খাওয়ার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। তবেই সরকারি অনুমতি পাওয়া যায়। আগে সপ্তাহে একদিন বিমান যেতো। এখন ভরসা পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ২৪ ঘন্টার জাহাজ সফর বা হেলিকপ্টার সার্ভিস। যারা আদিম, বে-আব্রু প্রকৃতিকে ভালোবাসেন তাদের কাছে আদর্শ ভ্রমণকেন্দ্র হল নিকোবর। আসুন নিকোবরের ওপর আপনার আগ্রহটা আর একটু উসকে দেওয়া যাক। গল্প নয়, আমার চোখ, কান, হৃদয়ের অনুভূতিগুলিই অবিকৃতভাবে উপস্থাপন করছি।

আমার যেতে হয়েছিল ম্যালেরিয়া রিসার্চ সেন্টারে কাজে প্রায় বছর বারো তেরো আগে। সে যুগে ছিল না ইমেল, না ছিলো ফ্যাক্স। সুতরাং একমাত্র ভরসা ডাকবিভাগ। যাওয়ার দিন পনেরো আগে ম্যালেরিয়া রিসার্চ সেন্টারের ডাইরেক্টর ডঃ গিরির কাছে আমার যাত্রার খুটিনাটি জানিয়ে চিঠি দিয়ে রওনা হই। কার নিকোবর সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিলো না এমনকি এমন কোন লোকের সন্ধান পাইনি যে পূর্বে নিকোবর গিয়েছে, প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি আজও পাইনি। সপ্তাহে একদিন ফ্লাইট পোর্টব্লেয়ার হয়ে কার নিকোবর যাবে। দমদম বিমানবন্দরে চেক্ ইন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে, এমন সময় খুবই সাধারণ বেশভূষার এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কার নিকোবরে যাচ্ছেন"। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে ভদ্রলোক বললো, "আপনার লাগেজ তো ছোট, আমার একটা লাগেজ নেবেন"। এমন আনুরোধ শোনা আমার মত তৎকালিন চ্যাংড়া বিমানযাত্রীদের সে সময় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। সেই যুগে অনুরোধ রাখতেই হতো কারণ তখন হঠকারিতার ভয় এতটা প্রকট ছিলো না। আজ সমস্যা এত জটিল যে এই ধরনের অনুরোধ কেউ করতে সাহস পায় না কারণ এটা নিশ্চিত কেউই এ রিস্ক নেবে না। আমার লাগেজ বাদ দিয়েও কেজি পনেরো মাল অনায়াসেই লাগেজ হিসাবে নিতে পারতাম। বললাম, "নিতে পারি তবে লাগেজ খুলে দেখাতে হবে"। এটাই ছিল অলিখিত নিয়ম। ভদ্রলোক সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। দূরে দাঁড়ানো আর একজনকে ইসারায় ডাকতে সে একটা ঢাউস তরি তরকারির ঝুড়ি, খুব সুন্দরভাবে প্যাক করা, ট্রলিতে করে এনে কাউন্টারের সামনে রাখলো। বাইরের থেকেই ঝুড়ির মধ্যেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সুতরাং সন্দেহের কোন কারণ নেই। আমার মালপত্রের সঙ্গে ঝুড়িটাও লাগেজ হিসাবে বুক করে দিলাম। ভদ্রলোক বললেন, "আসুন আমাদের মালিক যে আপনার সঙ্গে যাবে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই"। ঠিকই তাকে চিনে রাখা দরকার কারণ মালটা

কারনিকোবরে তাকেই দিতে হবে। আমাকে অদূরে বসে থাকা ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের এক অবাঙালি ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের বেশভূষা দেখে বোঝা যাচ্ছে 'মালিক' সম্বোধনটি সুপ্রযুক্ত। হ্যান্ডসেক্ করে হ্যালো-হাইতেই পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখলাম, তার বেশি কিছু প্রয়োজন নেই।

বিমান যখন পোর্টব্লেয়ারে নামলো তখন সব যাত্রি নেমে গেলো। দেখলাম বিমানে আমি আর ওই ভদ্রলোকই বসে। বিমান তেল ভরে আবার রওনা হলো কার নিকোবরের উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে আর একজন বিমানে এসেছেন। এয়ারহোস্টেজের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তৃতীয় ব্যক্তি এয়ারলাইন্সের ইঞ্জিনিয়ার। এটাই নিয়ম কারণ কার নিকোবরে গিয়ে বিমানে ছোটখাটো কোন গোলযোগ দেখা দিলে সেটা সারানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ার যাওয়ার আর কোন উপায় নেই। ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক এই বিমানে যাবে আবার ফিরে আসবে। তার মানে প্রায় দেড়শো সিটের বিমানে সর্বসাকুল্যে তিনজন যাত্রি। প্রায় আধঘন্টা সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়লাম। নিচে হালকা মেঘ, তারও অনেক নিচে অস্পষ্ট জলরাশি, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে দুই একটা ছোট ছোট দ্বীপ। পাইলট সিটবেল্ট বাঁধার ঘোষণা করলো অর্থাৎ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যান্ড করবো। দেখলাম এয়ার হোস্টেজরাও তদের নির্দিষ্ট জায়গায় না বসে বাঁ দিকের জানলার পাশে এসে বসলো। আমাকেও বললো বাঁ দিকে এসে বসতে। কারণটা একটু পরেই বুঝলাম। বিমান খুব নিচে নেমে এসে বাঁ দিকে কাত হয়ে দ্বীপটাকে একবার চক্কর দিলো। সে এক অপরূপ দৃশ্য। দিগন্তবিস্তৃত নীল জলরাশির মাঝে ছোট গোলাকৃতি দ্বীপটা ভাসছে। দ্বীপের মধ্যভাগে গাঢ় সবুজ রঙ, প্রধানত নারিকেল গাছের ঘন বন। তার চারপাশ ঘিরে চক্রাকৃতির সোনালি তটভূমি। জনশূন্য তটভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটি গ্রাম চোখে পড়ছে। তারপর অপার জলরাশি চক্রাকারে তিনরঙে বিভক্ত। তটভূমি লাগোয়া অংশ সাদাটে তুতে রঙের। তারপর হালকা তুতে রঙের স্বচ্ছ কাচের মত জলে খাড়াই ওপর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের তলদেশ। এ দৃশ্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শেষে তুতে রঙ ঘন হতে হতে গাঢ় নীল ও কালো হয়ে দিগন্তে মিশেছে। শুনেছি কারনিকোবর দ্বীপটি সমুদ্রের মাঝে একটা চুনা পাথরের পাহাড়ের ওপর অবস্থিত, সেই কারণে জল এত পরিষ্কার আর রঙ এত সুন্দর।

কারনিকোবরে বিমান থেকে নামলাম। ছোট বিমানবন্দর, হেঁটে অদূরে টারম্যাকে এসে দাঁড়ালম, লাগেজ নিয়ে প্রস্থানের অপেক্ষায়। কয়েকজন লোক আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করলো কোথায় যাবো, বললাম, ম্যালেরিয়া রিসার্চ সেন্টার। তারা আমাকে খুব খাতির করে একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসালো। তারপর আমার লাগেজ কুপনটা চেয়ে লগেজটা তারাই নিয়ে এসে একটা গাড়িতে তুললো। আমাকে নিয়ে গাড়িটা রওনা দিলো। বুঝলাম ডঃ গিরি আমার চিঠি পেয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। গাড়িটা চালাচ্ছিলো নিকোবরের এক আদিবাসি যুবক। আমার পাশে বসে আর একজন। পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম "এটা কি ম্যালেরিয়া রিসার্চ সেন্টারের গাড়ি"। ভদ্রলোক বললো, "না, তবে আপনাকে পৌঁছে দেবো। কোন চিন্তা নেই"। গাড়িটা আমাকে ম্যালেরিয়া রিসার্চ সেন্টারের গেটে নামিয়ে দিলো। ভাবলাম ড্রাইভারকে কিছু টিপস্ দেওয়া প্রয়োজন। পকেটে হাত ঢুকিয়েও নিজেকে নিরস্ত করলাম কারণ অভিজ্ঞতা বলে অচেনা লোকের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে টিপস্ অফার করতে নেই। ম্যালেরিয়া রিসার্চ সেন্টারের দ্বাররক্ষী আমার লগেজটা ড্রাইভারের হাত থেকে নিলো। তাকে ডঃ গিরির কথা বলতে সে তোমাকে ডঃ গিরির চেম্বারে নিয়ে গেলো। ডঃ গিরিকে আমার পরিচয় দিতে উনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "আপনি খবর না দিয়ে এমন হুট করে চলে আসলেন, আপনিতো বিপদ পড়তে পারতেন!" আমি বললাম, "কেন চিঠি পাননি, দিন পনেরো আগে চিঠি দিয়েছি।" ডঃ গিরি বললেন, "দিন পনেরো আগে? ওটা মাসখানেক পরে আমার কাছে পৌঁছাবে, এখন বলুন আপনি এখানে আসলেন কি করে। এখানে তো আমাদের কলকাতার মত কোন ট্যাক্সি, ভাড়ার গাড়ি বা বাস কিছুই পাওয়া যায় না।" আমি বললাম, "আমাকে তো একদল লোক খুব খাতির করে বসিয়ে, নিজেরাই আমার লাগেজ বয়ে এনে, তারপর গাড়িতে করে আপনার এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলো। আমি তো ভাবছিলাম আপনিই এইসব ব্যবস্থা করেছেন।" ডঃ গিরির আর একপ্রস্থ বিস্মিত হবার পালা। বেল দিয়ে দারোয়ানকে ডেকে পাঠালেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলো তাদের এখানকার অলিখিত রাজা বলতে পারেন। এখানকার ব্যবসার সিংহভাগই ওদের হাতে। যে গাড়ি চালাচ্ছিলো সেও ওই মালিক পরিবারেরই ছেলে।" আমি বললাম, "বলছেন কি? আমি তো তাকে দশ-বিশ টাকা টিপস্ দিতে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস দিনি তাহলে কেলেঙ্কারি হত।" ডঃ গিরি হেসে বললেন, "আমার আপনার মত কয়েকশো লোককে ওরা কিনে রাখতে

পারে। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি ওরা আপনাকে এত খাতির কেন করলো। কোন ঘটনা কি ঘটেছিল?" আমি তখন দমদম বিমানবন্দরে লাগেজ নেওয়ার ঘটনা খুলে বললাম। ডঃ গিরি ওই অবাঙালি ভদ্রলোকের বিবরণ আমার মুখ থেকে শুনে বললেন, "এখন বুঝেছি। যে ভদ্রলোককে আপনি হেল্প করেছেন উনি একজন গুজরাটি ব্যবসায়ী। প্রায় একশ বছর ধরে ওরাই এখানকার সব মালপত্র সাপ্লাই করছে। সেইহেতু এখনকার ওই ব্যবসায়ী পরিবারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ, আসা যাওয়া। ওরা যদি না নিয়ে আসতো তাহলে আপনি কি করতেন ভাবতেই আমার ভয় হচ্ছে। ফিরে যাওয়ার ফ্লাইটও এক সপ্তাহ পরে।" সব শুনে বুঝতে পারলাম কত বড় বিপদের থেকে রক্ষা পেয়েছি। উপকারের প্রত্যুত্তরটা যে এতো বিরাট হতে পারে তা ভাবতেও পারিনি।

এরপরে যা যা হলো সবই আমার কাছে নতুন। কারনিকোবরে কোন হোটেল বা প্রাইভেট থাকার জায়গা নেই তা আগেই বলেছি। যেহেতু সরকারি কাজে এসেছি, ডঃ গিরির চেষ্টার একমাত্র থাকার জায়গা আন্দামান নিকোবর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির গেষ্ট-হাউসে জায়গা মিলে গেলো। রিসার্চ সেন্টার আর গেষ্ট-হাউস পাশাপাশি একেবারে সমুদ্রের ধারেই। গেষ্ট-হাউসের কিছুটা দূরেই পাওয়ার হাউস। পাওয়ার-হাউস বলতে একটা বড় জেনারেটর। সেটা চলিয়ে শুধুমাত্র সন্ধ্যার সময়েই দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। সরকারি বড় সংস্থা বলতে আর একটাই আছে, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রর।

আমার কাজ ছিলো একদিনের কিন্তু থাকতে হবে বাধ্যতামূলক সাতদিন কারণ ফিরতি বিমান পাওয়া যাবে আসছে রবিবার। সোমবারই কাজ শেষ করে ফেললাম। মঙ্গল থেকে শুরু হলো ঘোরার পালা, সকালে উঠে বেরিয়ে পড়তাম সেন্টারের কাজের দলের সঙ্গে। একটা পনেরো বিশ সিটের ছোট বাসে করে চলে যেতাম দ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে। ওখানে লেবাররা কাজ করতেন আর আমি ঘুরে ঘুরে আশপাশ দেখতাম। কোনদিন বা দ্বীপের মাঝখান ঘন জঙ্গলে। চার পাঁচ জনের একটা দল আমার সঙ্গে গাইড হিসাবে থাকতো। ওদের নিয়ে অনেক ফটো তুললাম যাতে কারনিকোবর কি তার একটা ধারণা চেনা-পরিচিতদের দিতে পারি। একটা জিনিষ খেয়াল করতাম। বিভিন্ন নারকেল বাগানের সামনে গোলপোস্ট-এর মত তিনটে বাঁশ বাধা। তাতে কোথাও ঝুলতে নারকেল পাতা, কোথাও ছোবড়া, কোথাও বা নারকেল। ভাবলাম আদিবাসীদের কু-সংস্কার হবে। একদিন সঙ্গী-সাথীদের জিজ্ঞাসা করতে জানলাম যে এটা সরপঞ্চ-এর নির্দেশ। অর্থাৎ যে বাগানের সামনে ছোবড়া টানানো সেখান থেকে নারকেল পেড়ে ছোবড়া ছাড়িয়ে তবে নারকেল নিয়ে যেতে হবে কারণ ওই ছোবড়া পচে বাগানে সার হবে। তেমনই নারকেল পাতা যেখানে টাঙানো সে বাগান থেকে নারকেল পাতা বাইরে নেওয়া যাবে না। যে বাগনে নারকেল গাছ কম (কম মানে তাও এক কাঠা জমিতে গোটা দশেক হবে) সেখান থেকে নারকেল পাড়া বারণ কারণ গাছের নারকেল পড়ে সেখানে আরো গাছ হবে। তবে একটা সংস্কার আছে যার উদ্দেশ্যই ওই এক। গাছ থেকে নারকেল পাড়তে হবে। সেটা যদি নিজের থেকেই মাটিতে পড়ে যায় তবে ওটা কেই ছোঁবে না অমঙ্গলের ভয়ে। সেই কারণে সব বাগানেই দেখতাম অজস্র নারকেল পড়ে ছোট ছোট শিষ বা গাছ হয়ে আছে। একদিন খুব তেষ্টা পেয়েছে। ওদের কাছে ডাব খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ওরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। কারণটা বুঝলাম না কারণ চারিদিকেই পাঁচ-ছ ফুটের সরু সরু কিং-নারকেল গাছে লালচে-হলুদ অজস্র ডাব হয়ে আছে। ওরা কুণ্ঠিত ভাবে বললো যে ডাব খাওয়ানো যাবে না কারণ ডাব পাড়া বারণ।

রোজ বিকেল হবার আগেই ফিরে আসতাম গেষ্ট-হাউসে। তারপর চা খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গিয়ে বসতাম সমুদ্রের ধারে। নির্জন সৈকতে হেঁটে বেড়াতাম নিজের খেয়ালে। দেখতাম জোয়ার ভাঁটার খেলা, সূর্যের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের রঙ পরিবর্তন। পায়ে পায়ে মাড়িয়ে যেতো অজস্র রঙ-বেরঙের শামুক। দেখতাম স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছোট ছোট ছেলেদের সমুদ্রে ডুব দিয়ে খালি হাতে মাছ ধরা। তারপর দেখতে দেখতে আকাশ রাঙিয়ে সমুদ্রের মাঝে ঝুপ করে ডুবে যেতো সূর্য। আমি ফিরে আসতাম গেষ্ট-হাউস বা কোনদিন হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম আধ মাইল দূরের ছোট্ট বাজারটায়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। বাজারে যদিও কেনাকাটা এখানকার মত টাকা পয়সার হয় তবুও এখনো সেই কয়েকশো বছরের পুরানো বিনিময় প্রথাও আছে। অর্থাৎ দশটা নারকেলের বদলে এক কেজি চাল বা দুশোটা নারকেলে একটা জিনিস্ এর প্যান্ট প্রভৃতি। বহু আদিবাসীদের দেখতাম সেভাবেই কেনাকাটা করছে। এমনকি যে গুজরাটি ভদ্রলোকের কথা আগে বলেছি তারাও লেনদেন করে বিনিময় প্রথায়। মেনল্যান্ড থেকে জাহাজে করে নিয়ে যায় ব্যবহার্য মালপত্র,

বিনিময়ে নিয়ে আসে নারকেল, শঙ্খ প্রভৃতি। চোখে দেখিনি কিন্তু শুনেছি ওঙ্গিঁরা মাঝে মাঝে নৌকা করে এসে এই বাজারে হাজির হয়। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে আবার চলে যায়। দোকানদারেরা ছোটখাটো জিনিস এমনিতেই দিয়ে দেয়। একটু ভয়ও আছে কারণ কোন গণ্ডগোল পাকালে মুশকিল, প্রশাসনের ঝক্কি পোয়াতে হবে।

ডঃ গিরি রোজ আমার কাছে শুনতেন কোথায় কোথায় ঘুরলাম, কি দেখলাম ইত্যাদি। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সাঁতার জানি কি-না। জানি বলতে বললেন, "তবে কাল একটা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসুন যা অন্য কোথাও পাবেন না। আর কিছু না বলে বললেন পরেরদিন সকাল ছ'টায় তৈরি থাকতে। পরদিন আমাকে গেষ্ট হাউস থেকে তুলে, নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে গেলেন দ্বীপের অন্য প্রান্তে এক গ্রামে। দেখলাম কয়েকজন লোক নৌকা নিয়ে সমুদ্রযাত্রার তোড়জোড় করছে। ডঃ গিরিকে দেখে তাদের কয়েকজন এগিয়ে এলো। বুঝলাম ডঃ গিরিকে চেনে ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ডঃ গিরি ওদের সাথে ওদের ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলে আমাকে বললেন, "যান ওদের সাথে ঘুরে আসুন"! এবার আমি বেঁকে বসলাম, কিছুটা ভয়েই। বললাম, "না-না, ওই পুঁচকে পুঁচকে নৌকায় মাছ ধরতে যাবার আমার কোন শখ নেই, তার ওপর ওরা কখন ফিরবে তার কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না, আকাশের অবস্থাও সুবিধার না!" ডঃ গিরি হেসে সাহস জোগালেন, "ভয়ের কিছু নেই, ওরা বেশিদূর যাবে না। এই এক কিলোমিটার মত যাবে আবার এগারো-বারোটা নাগাদ ফিরে আসবে। আমি বারোটার সময় গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।" ভাবলাম, তাহলে যাওয়া যেতে পারে, ব্যাপারটা মন্দ হবে না। চেপে বসলাম ওদের নৌকায়। দুটো নৌকা ছাড়লো আমি ছাড়া আর চারজনকে নিয়ে। বহুদূর পর্যন্ত দেখলাম সমুদ্র অগভীর, জলের নিচে পাথর, ছোট ছোট উদ্ভিৎ, ছোট মাছের ঝাঁক, সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একজায়গায় গিয়ে হঠাৎ করে গভিরতা বেড়ে গেলো। জেলেরা বললো এখানে সমুদ্রের তলদেশ খাড়াই দেওয়ালের মত নিচে নেমে গিয়েছে, তাই নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুইজন জেলে জলে নামলো, তারপর দুইজনে একসঙ্গে ডুব দিলো। কোন গ্যাস মুখোশ ছাড়া অনেকক্ষণ নিচে থাকার পর দুইজনেই একসঙ্গে ভুস্ করে ভেসে উঠলো। দেখলাম দু'জনের হাতেই একখানা করে বেশ বড় আকারের ধুসর-সাদা বর্ণের শামুক। ওদের কথায় বুঝলাম এগুলো সেই শামুক যেগুলোকে আমরা শঙ্খ বলি। জলের নিচে খাড়াই ঢালে এগুলো ঝুলে ঝুলে থাকে। এমন প্রাকৃতিক গঠন ও পরিবেশই ওদের প্রজনন্ ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে আদর্শ। সেই কারণে সব সমুদ্র বা দ্বীপে শঙ্খ পাওয়া যায় না। এইভাবে বেশকিছু শঙ্খ সংগ্রহের পর আমরা ফিরে এলাম। সত্যিই এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

আন্দামান ও নিকোবরের দ্বীপগুলির মধ্য কার-নিকোবরের বেশ কিছু বিশেষত্ব আছে। ধারে কাছের দ্বীপগুলির মধ্য কেবল এখানেই পাওয়া যায় মিষ্টি পানীয় জল। এই তথ্য সুদূর অতীত থেকে অভিযাত্রি, পর্যটক ও ব্যবসায়ী জাহাজের গোচরে ছিল। ইতিহাস ঘেঁটে পাওয়া যায় ভাস্কো-ডা-গামা থেকে শুরু করে বহু অভিযাত্রির অস্থায়ী অস্তানা ছিলো কার-নিকোবর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কার-নিকোবর ছিলো জাপানি কব্জায়, তাদের সামরিক ঘাঁটি। এখনও সমুদ্রের ধারে ধারে চোখে পড়ে জাপানি বাঙ্কারের ধ্বংসস্তূপ।

কার-নিকোবর যদিও ভারতের অঙ্গ কিন্তু ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে। পক্ষান্তরে বলা যায় সুমাত্রা, জাভা, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুরের প্রতিবেশি। কার-নিকোবরের পূর্বপ্রান্তে প্রতি পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরে দরে আছে জনমানব শূন্য এক একটা ছোট দ্বীপ। স্থানীয় জেলেরা মাছ ধরতে বেরিয়ে সেইসব দ্বীপে অস্থায়ী আস্থানা গাড়ে, তারপর এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে। এইভাবে চলে যায় সুমাত্রা, জাভা উপকুলে। কখনো কখনো দিগভ্রান্ত হয়ে ঢুকে পড়ে ওইসব দেশের সমুদ্র সীমানায়। এমন কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে যাদের পরিজন ওইসব দেশে বন্দী, তারা অপেক্ষা করে আছে ওদের পথ চেয়ে।

পাঠক নিশ্চই আমাকে সেই দোষে দুষ্ট করছেন যেখানে সব-ভালো দিয়ে লেখক তার রম্য রচনাকে রমণীয় করে তোলে। না, সব ভালো না, খারাপও অনেক কিছু দেখেছি। দারিদ্র্য ভেঙে পড়া বাড়ি, অপুষ্টিতে আক্রান্ত হাড় জিরজিরে শিশু, চিকিৎসার অভাব, যোগাযোগের অভাব, সরকারের উদাসীনতায় দারিদ্রলাঞ্ছিত প্রতিবাদহীন এক জনগোষ্ঠী।

সব শেষে একটা ঘটনা না বললে আমার হৃদয়ের অনুভূতিগুলিই অবিকৃত ভাবে উপস্থাপন করার অঙ্গীকার মিথ্যাভাষণ হয়ে যাবে। কার-নিকোবরের সঙ্গে নিকোবরের অন্য দ্বীপগুলির যোগাযোগ পুরোপুরিই জলপথ নির্ভর। আমার গেষ্ট-হাউসের কাছেই একটা জেটি ছিলো যেখানে সারাদিন নিকোবরের অন্য দ্বীপগুলি থেকে বোট এসে ভিড়তো। ওখানে সবসময়েই হাজির দেখতাম এক মধ্যবয়স্কামানসিক

ভারসাম্যহীন মহিলা। সবসময়ই বিড় বিড় করে কিছু বলে চলেছে ও হেসে চলেছে। কিন্তু যখনই কোন বোট নোঙ্গর করবে, ছুটে চলে আসছে সেই বোট-এর কাছে। বোট থেকে ছুঁড়ে দেওয়া দড়ি নিপুণ দক্ষতায় লুফে নিয়ে বেধে দিচ্ছে জেটির পিলারে। বেশ কয়েকদিন একই ঘটনা দেখার পর একটু কৌতূহল জন্মাল। পাকড়াও করলাম এক বয়স্ক সারেঙ্গকে। জিজ্ঞাসা করলাম ওই মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা কে? ও তো দেখছি সারা দিন-রাত, এক গুরু দায়িত্ব বহন করে চলেছে। ও কি এখানকার কর্মি বা কোন আর্থিক সাহায্য পায়? সারেঙ্গ যা বলল তা তার ভাষাতেই বলি।

ওই মহিলার নাম পিলপি। ওর স্বামী একটা ছোট বোট চালাতো। আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে এক ভয়ঙ্কর দূর্যোগের রাতে ওর স্বামী বোট নিয়ে ফিরছিল। সমুদ্র উত্তাল, তার ওপর ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ। সে বোটটিকে একটি ছোট দ্বীপে নোঙ্গর করানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সেই দ্বীপে ছিল না কোন সাহায্য কারি যে ছুঁড়ে দেওয়া দড়ি ধরে কোন গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে দিতে পারে। বারবার দড়ি ছুঁড়ে সে গাছের গুড়ি বা পাথরে আটকানোর চেষ্টা করে অসফল হয়। শেষে ধাক্কা খেতে খেতে প্রবল ঝড়ে বোটটি উল্টে যায় ও ওর স্বামী আটকা পড়ে মারা যায়। সেই থেকে ও এই জেটিতে। এখনও বিশ্বাস ওর স্বামী মারা যায়নি নিশ্চই কোথাও আছে, একদিন ফিরে আসবে। তাই যখনই কোন বোট নোঙর করতে আসে ও ছুটে এসে সাহায্য করে বোটটিকে নোঙর করতে। আরেকটু খেয়াল করলে দেখবেন ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে প্রত্যেক যাত্রীকে, খুঁজে বেড়ায় ওর স্বামীকে।

আমি নিকোবর থেকে চলে এসেছি। এখনও চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই একের পর এক বোট নোঙর করছে আর পিলপি খুঁজে চলেছে তার হারানো স্বামীকে। ❑